বাংলাদেশের কবিতা

সুজিত সরকার

না, শামসুর রাহমান নয়, বাংলাদেশের কবিতার কথা ভাবলে সর্বাগ্রে যে দু'জন কবির নাম আমার মনে পড়ে তাঁরা হলেন জসীমউদ্দীন ও আল মাহমুদ। কিন্তু কেন? এখনও পর্যন্ত শামসুর রাহমানই তো কবি হিসেবে সর্বাধিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, তাহ'লে? এর কারণ সম্ভবত এই যে 'বাংলাদেশ' শব্দটি শুনলেই আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে নদীবহুল গ্রামপ্রধান এক দেশ যাকে ঘিরে রয়েছে অফুরান শ্যামলিমা—'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। জসীমউদ্দীন ও আল মাহমুদ দুজনেই মুখ্যত গ্রামজীবনের কবি। বাংলার পল্লী অঞ্চল ছড়িয়ে থাকা বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই জসীমউদ্দীনের জন্ম, বেড়ে-ওঠা। মাঠে-ঘাটে, নদীতীরে, বালুচরে, অতিসাধারণ গ্রামের মানুষদের সাহচর্যে বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে তাঁর। পুঁথিসাহিত্য, গ্রাম্যগীতি-গাথা, রূপকথা তাঁর মানসিক পুষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেছিল। আর তাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করলেও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেও, বাংলা সাহিত্যের সেই বিখ্যাত কল্লোলযুগে কলকাতার 'কল্লোলে' কবিতা লিখলেও জসীমউদ্দীন রাজপথ দিয়ে না হেঁটে বাংলার মেঠো পথ দিয়েই হেঁটে গেছেন, পল্লীগীতি সংগ্রাহকের ভূমিকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন নিরন্তর বাংলার গ্রামে গ্রামে, কৃষিজীবী মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন সহজেই, তাঁদের আপনজন হিসেবে বিবেচনা করেছেন ঃ

ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না!

'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর রচয়িতা জসীমউদ্দীন তাঁর কবিতায় যে নারীর ছবি এঁকেছেন সে গার্হস্থ্য নারী ঃ

সেই মেয়েটির কি হয়েছে আজ, রান্নাঘরের ফাঁদে
টানিয়া আনিয়া বন্দী করেছে গগন-বিহারী চাঁদে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার একবার নাকি অভিমানে বলেছিলেন, বাংলা কবিতার রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে conspiracy of silence রয়েছে। আমি একজন আমন্ত্রিত কবিরূপে বাংলাদেশের ঢাকা-রাজশাহী-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন কবিতা-উৎসবে যোগদান ক'রে অনুভব করেছি শামসুর রাহমানের সমকালীন এবং প্রকৃত অর্থে একজন বড়ো কবি আল মাহমুদ সম্পর্কেও সেরকমই এক conspiracy of silence যেন বাংলাদেশের কবিমহলে বিদ্যমান। বাংলাদেশের কবিদের সঙ্গে আড্ডায় আল মাহমুদকে 'মৌলবাদী' আখ্যায় আখ্যাত হ'তেও শুনেছি। আমার অনুমান, উগ্র ধর্মবিশ্বাস হয়তো তাঁর প্রতি অভিসন্ধিমূলক নীরবতার মূল কারণ। তবে, এ-ও ঠিক, এভাবে তাঁর অসামান্য কবিতাগুলির থেকে প্রকৃত কবিতাপাঠককে দূরে সরিয়ে রাখার হাস্যকর প্রচেষ্টা কোনোদিনই সফল হবে না। তাঁর লেখা নিচের লিরিকটি, আমার

কাছে, বাংলাভাষায় রচিত অসামান্য প্রেমের কবিতাগুলির অন্যতম :

তোমার হাতে ইচ্ছে করে খাওয়ার
কুরুলিয়ার পুরোনো কই ভাজা;
কাউয়ার মতো মুন্সী বাড়ির দাওয়ায়
দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা

বলবে নাকি, এসেছে কোন্ গাঁওয়ার?

ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ
আমার মতো বোঝেনি আর কেউ,
তবু যে হাত নাড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায়
শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।

আঞ্চলিক শব্দের চমৎকার প্রয়োগ আল মাহমুদের কবিতাকে এক মধুর সৌরভে সুরভিত করেছে। তিনি মনে করেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক ঘেয়েমি কাটাতে এই আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার হওয়া দরকার। কিন্তু 'নির্বিচার আহরণে'র পক্ষপাতি তিনি নন। তাঁর বিশ্বাস আধুনিক বাংলা ভাষার চলতি কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের 'কাব্যময় প্রয়োগ' ঘটলে 'ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্রতরঙ্গের মতো।'

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রামই প্রাধান্য পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হননি তিনি। তিনি বলেছেন 'আমি জন্মেছি গ্রামে। আমার চতুর্দিকে যতদূর চোখ দেখা যায় শুধু গ্রাম আর গ্রাম। আর শস্যের মাঠ। মাঠের গা ঘেঁষে নদী। নারীর শাড়ির মতো নকশাকাটা তার দু-পাড়। আমার মনে হয়েছে নদী থেকেই বাংলার আদি পোশাকের অর্থাৎ শাড়ির উদ্ভাবন হয়েছে মেয়েদের হাতে, কৃষির উদ্ভাবনের মতো। আমি মাছ আর ধানের গন্ধে ভরপুর মানুষ। যে দেশের পুরুষ তার প্রথম প্রেমিকাকে পাটক্ষেতের ভেতর প্রথম চুম্বনের সুযোগ পায় আমি তো সে দেশেরই কবি।' আল মাহমুদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সোনালি কাবিন'। মূলত 'সোনালি কাবিন'-এর সনেটগুচ্ছের কারণেই তিনি কবিতাপাঠকদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনটি অধিকার করেছেন। তাঁর একটি অতিপরিচিত কবিতার শেষ স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
ম্লানমুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম। শামসুর রাহমান মারা গেছেন ২০১০ সালে। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে শামসুর রাহমানই ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বপ্রধান কবিরূপে পরিগণিত হন। তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি হয়ে ওঠে একটা জাতির দেশপ্রেমজনিত আবেগের সর্বোত্তম কাব্যিক প্রকাশ ঃ

স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

.....
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
.....
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

আশি বছরের জীবনে অর্ধশতাধিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন শামসুর রাহমান। তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায় সমসাময়িক ঘটনাবলীকে আশ্চর্য কবিপ্রতিভায় অসাধারণ শিল্পসুধামণ্ডিত কবিতায় রূপান্তরিত করতে তাঁর মতো কেউই পারেন নি। 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত **'আসাদের শার্ট'** কবিতাটি এক্ষেত্রে একটি সার্থক দৃষ্টান্তরূপে বিবেচিত হ'তে পারে। ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়, ত্বরান্বিত হয় স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের পতন। রক্তরঞ্জিত **আসাদের শার্টকে** পতাকা ক'রে এগোতে থাকে সুদীর্ঘ মিছিল। কবিতাটি সেই উপলক্ষে রচিত ঃ

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষিয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর—শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ে রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি ফোটায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

সৈয়দ শামসুল হক একজন সব্যসাচী লেখক। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অনুবাদক। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই ছিল তাঁর অনায়াস যাতায়াত। চলচ্চিত্রের কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপও লিখেছেন। লণ্ডনে গিয়ে বিবিসির বাংলা খবর পাঠক হিসেবে চাকরি করেছেন। বিবিসি বাংলার প্রযোজকের দায়িত্বও পালন করেছেন। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মান 'একুশে পদক' লাভ করেন। এমনকি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেন।

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

বিখ্যাত 'আমার পরিচয়' কবিতাটির মাত্র প্রথম দুটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করলাম। সৈয়দ শামসুল হককে কলকাতার সাহিত্য অনুষ্ঠানে, হলদিয়ার কবিতা উৎসবে দেখেছি। কিন্তু আমন্ত্রিত কবি হিসেবে ২০১৪-য় যেবার রাজশাহীর জীবনানন্দ কবিতামেলায় যাই সেবারই তাঁর কাছাকাছি আমার সৌভাগ্য হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শা-জাহান' কবিতাটির অসাধারণ আলোচনা করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ এই কবিতাটির প্রথম ১৬ লাইন স্মৃতি থেকে ব'লে গেলেন তিনি অর্থাৎ প্রথম স্তবক। 'শুধু থাক/একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল'—বলার পরে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আপনাদের অনেকের মতোই আমারও একসময় মনে হয়েছিল, কবিতাটি তো এখানেই শেষ হলে ভালো হ'ত, কেন রবীন্দ্রনাথ তারপরেও কবিতাটি আরো অনেকগুলি স্তবক যোগ ক'রে এটিকে দীর্ঘ কবিতায় পরিণত করলেন! এরপর প্রতিটি স্তবক স্মৃতি থেকে ব'লে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করলেন স্তবকগুলির অনিবার্যতা এবং সবশেষে বললেন, আমাদের ভাবনা যার পরে আর এগোতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা তারপরেও অনেক দূর যেতে পারে। তাঁর আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং আমার কাছে, তারো চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হ'ল, আমার জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতাটির আলোচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল! তিনি বলেছিলেন, ভারি চমৎকার বললেন আপনি, এভাবে ভাবিনি তো! তাঁর বিখ্যাত সনেট 'পরাণের গহীন ভিতর'—যার প্রথম চার লাইন এরকম ঃ

জামার ভিতর থিকা যাদুমন্ত্রে বারায় ডাহুক,
চুলের ভিতর থিকা আকবর বাদশার মোহর,
মানুষ বেকুব চুপ, হাটবারে সকলে দেখুক
কেমন মোচড় দিয়া টাকা নিয়া যায় বাজিকর।

শেষ দু'লাইনে কবি বলবেন ঃ

এ বড় দারুণ বাজি, তারে কই বড় বাজিকর

যে তার রুমাল নাড়ে পরানের গহীন ভিতর।

প্রেমের কবিতা প্রায় সব কবিই লেখেন। কিন্তু 'প্রেমের কবি' কথাটি সবকবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বাংলাদেশের রফিক আজাদকেও, প্রকৃত অর্থেই, প্রেমের কবি বলা যেতে পারে ঃ

যদিও জেনেছি আমি এটি রিমোট কন্ট্রোল যুগ,
তোমার আমার মধ্যে, তবু, আমি হাজার মাইল
টেলিফোন তার, আর ঐ পুশ্‌বাটন্,
লং ডিসট্যান্স সব টেলিফোন কল্...
এসবের মধ্যে আমি, কোনোক্রমে চাইনা তোমাকে—
তোমাকে তো আমি কাছে চাই, পাশে চাই—
জীবন সর্বোচ্চ সুখে চাই, সকল সঙ্গমে চাই,
রোমকূপে-রোমকূপে চাই, ত্বকের লাবণ্যে চাই,
উরুর উত্থানে চাই — আনন্দিত আলিঙ্গনে চাই ঃ
সুখে-দুঃখে জীবনের এই প্রতিটি মুহূর্তে চাই।।

বাংলাদেশের কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সুতীব্র আবেগময়তা। একথাও ঠিক, এই আবেগময়তা থেকেই সার্থক প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে। 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতাটি রফিক আজাদের বিখ্যাত কবিতা। যদিও এটি প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু এই কবিতাটির মধ্যেও কবির প্রচণ্ড আবেগ লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না।

শহীদ কাদরী বাংলাদেশের একজন শ্রদ্ধেয় কবি। ১৯৭৮ সালে সেই যে ঢাকা ছেড়েছিলেন, তারপর আর ফেরা হয়নি। বার্লিন, লন্ডন, বোস্টন ঘুরে শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কেই থেকে যেতে হয় তাঁকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে। কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর। জীবনের শেষ ছয়-সাত বছর হুইল চেয়ারেই এঘর-ওঘর করতেন, শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই', 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা', 'আমার চুম্বনগুলি পৌঁছে দাও' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বঁটিতে
রাত্রির উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নার মতো
হেলায়-ফেলায় পড়ে থাকে
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না;

মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেই ১৯৭৩-এ পেয়েছিলেন 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার, ২০১১-য় লাভ করেন 'একুশে পদক'। জার্মানিতে শহীদ কাদরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কবীর সুমনের, তিনি তখন বছর তিরিশের সুমন চট্টোপাধ্যায়। শহীদ কাদরী সম্পর্কে সুমন বলেছেন 'এইরকম একজন আপাদমস্তক শিক্ষিত আধুনিক, সম্পূর্ণ উদার অসাম্প্রদায়িক মানুষ আমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দেখিনি।' পরবর্তীকালে শহীদ কাদরীর 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা' কবিতাটি সুমনের গানের কারণে বহু মানুষের কাছে

পৌঁছে যেতে পেরেছে ঃ

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো—
এমন ব্যবস্থা করবো
বি-৫২ আর মিগ-২১গুলো
মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারাট্রুপারদের মতো ঝ'রে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে, প্রিয়তমা।

বাংলাদেশের এক জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণ। এতটাই তাঁর জনপ্রিয়তা যে অগণিত সাধারণ মানুষ তাঁকে শামসুর রাহমানের থেকেও বড় কবি হিসেবে বিবেচনা করেন। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব হত্যা, প্রেম ও প্রকৃতি — এই পাঁচটি বিশেষভাবে বাংলাদেশের কবিতার প্রধান বিষয়। এদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব হত্যা ও প্রেম নির্মলেন্দু গুণের কবিহৃদয়কে উথাল পাথাল করেছে। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কবিতা পছন্দ করতেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন। তাঁর প্রেমের কবিতাও সমান জনপ্রিয়। বাংলাদেশের কবিতায় আবেগের আতিশয্যের কথা আগেই বলেছি। যে কোনো স্মরণযোগ্য কবিতাই আবেগমথিত। নির্মলেন্দু গুণের করিতায় এই আবেগের স্থান সবকিছুর ওপরে। প্রেমের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় অতিশয়োক্তি অলংকারের ছড়াছড়ি। বাসস্টপে মাত্র তিন মিনিটের জন্য নীরাকে দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন ঃ 'এক বছর ঘুমোবো না।' মনে প'ড়ে যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' কবিতার লাইনগুলি ঃ 'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী' কিংবা 'সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।' নির্মলেন্দু গুণের সমকালীন কবি মহাদেব সাহাও তীব্র বিরহবেদনায় আবেগের অতিশয্যে ব'লে ওঠেন ঃ 'এক কোটি বছর হয় তোমাকে দেখিনা/একবার তোমাকে দেখতে পাবো/ এই নিশ্চয়তাটুকু পেলে—/বিদ্যাসাগরের মতো আমিও সাঁতরে পার হবো ভরা দামোদর/কয়েক হাজার বার পাড়ি দেবো ইংলিশ চ্যানেল।' কে না জানে, এসবই মিথ্যা কথা। কিন্তু এই মিথ্যা কারো কোনো ক্ষতি হয় না, বরং এই মিথ্যা প্রেমের কবিতাকে অবিস্মরণীয় ক'রে তোলে। ইংরাজিতে বলে 'sweet lie' অর্থাৎ মধুর মিথ্যা। নির্মলেন্দু গুণের প্রেমের কবিতাতেও সেই একইরকম অতিশয়োক্তি ঃ

তুমি চলে যাচ্ছো, নদীতে কান্নার কল্লোল,
তুমি চলে যাচ্ছো, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ,
তুমি চলে যাচ্ছো, চৈতন্যে অস্থির দোলা, লঞ্চ ছাড়ছে,
টারবাইনের বিদ্যুৎগতি ঝড় তুলছে প্রাণের বৈঠায়।
কালো ধোঁয়ার দূরত্ব চিরে চিরে ভেসে উঠছে তোমার
অপশ্রিয়মান মুখশ্রী, তুমি ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছো।
তোমার চ'লে যাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না,
তিন হাজার দিন ধরে তুমি যাচ্ছো, যাচ্ছো, আর যাচ্ছো।

উত্তম দাশ তাঁর সম্পাদিত 'বিশ্ববাংলা কবিতা' নামক মহাসংকলনটিতে বাংলাদেশের

কবিতার কথা বলতে গিয়ে লোকসংস্কৃতি ও দেশজ উপাদানের যে ধারাটির কথা উত্থাপন করেছেন সেই ধারার এক বিশিষ্ট কবি হিসেবে মুহম্মদ নুরুল হুদাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চান। তিনি বলেছেন, মুহম্মদ নুরুল হুদা 'বাঙালির জাতি সত্তার এক শিকড় সন্ধানী কবি'। 'আমরা তামাটে জাতি' কবিতাটির জন্যই মুহম্মদ নুরুল হুদা 'জাতিসত্তার কবি' হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। কবিতাটির প্রথম তিনটি লাইন ঃ

রোদ্দুরে নেয়েছি আর বৃষ্টিতে বেড়েছি
সহস্র শতাব্দী দিয়ে নিজেকে গড়েছি
আমরা তামাটে জাতি আমরা এসেছি।

উত্তম দাশ মনে করেন 'উত্তর আধুনিক দর্শনে নিজের উৎস সন্ধানে যে উচ্চারণ পৃথিবীর সর্বদেশে প্রচারিক তারই এক অন্তরঙ্গ কাব্যভাষ্য এই কবিতাটি।'

টাঙ্গাইল কবিতা উৎসবে ২০১৮-র জানুয়ারিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম। এত বড় একটা কবিতা উৎসব অথচ কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সবকিছুই অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছেন কবি মাহমুদ কামাল। কবি, অধ্যাপক এবং সুভদ্র একজন মানুষ। তাঁর একটি ছোট্ট কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

তোমাকে জেনেছি সত্য
দীর্ঘ দিন
আজ প্রমাণিত হলো
মিথ্যা।
তোমাকে জেনেছি মিথ্যা
দীর্ঘদিন
আজ প্রমাণিত হলো
সত্য।
সত্য ও মিথ্যা সংজ্ঞা
কে দিয়েছিলেন?
এখন তাকেই আমি
খুঁজছি।

বাংলাদেশের বিখ্যাত ও বিতর্কিত কবি আবু হাসান শাহরিয়ার আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। বয়সে আমার থেকে তিন চার বছরের ছোট। 'সমাত্মজীবনী' গ্রন্থে শাহরিয়ার তাঁর হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন ঃ 'গ্রামে গেলে আমি মানুষ থাকি না; —গাছ হয়ে যাই। ঘাটের হিজল আর হাওড়ের ম্যাড়াকে মনে হয় আমার মাটি সহোদরা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারলে প্রকৃতি মানুষের চেয়েও বেশি কথা বলে। ...আদিম চাষা ছাড়া সব মানুষই কম-বেশি বখে গেছে। জীবনভর পরিচর্যা পায় বলে মৃত্যুর আগে গাছ সোনালি শস্য তুলে দেয় চাষার হাতে।' এবার প'ড়ে নেওয়া যাক সেই কবিতাটি যাতে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

আমি লুঙ্গি-বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা
আমার বাপের নাম কে না জানে—চাষী-মালকোঁচা
আমি গামছা-কুমোরের প্রতিবেশী, জাতি গোষ্ঠী যত নিম্নজনা
ধুতি-গোয়ালারা জাতি, আরও জাতি খড়ম-তাঁতিরা
আমি লুঙ্গি বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা।

বারোভাজা তেরোভাজা তোমাদের তেলে ভাজা বুদ্ধি বিবেচনা
আমাকে ছোঁবে না—আমি কাঁচা মাছে, পোড়া মাংসে বাঁচি
আমার বউয়ের নাম চাঁচাসোনা, তোমাদের মতো বুকে কাঁচুলি পরে না
স্তনে মুখ ঘ'ষে দিয়ে চলে আসি, ঝাঁপিখোলা-ঝাঁপিবন্ধ নেই।

মাটি ভাষাভাষী শস্য, লতাগুল্ম, বৃক্ষ, বনরাজি
আমাকে শেখায় বীজমন্ত্র আমি শরীরের মাটিভাষা জানি
মাটি মাতৃভাষা আমি সে-ভাষায় সোঁদাগন্ধ পুঁথি পাঠ করি
যা পড়ি শেকড়ে পড়ি, বাকলে লিখি না নাম তর্জমাবশত।

আমি লুঙ্গি বাউলের নাতি, জন্ম মাটি বংশধরে
মুখ খিস্তি-খেউড়ের দোচোয়ালি, ব্যাকরণে টেঁকুর তুলি না।

বাংলাদেশের কবিতার অতিসংক্ষিপ্ত একটি ইতিবৃত্ত তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল এই গদ্যে। অনেক উল্লেখযোগ্য কবির কথাই যে বলা হ'ল না তা আমি জানি। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া এবং আমার মনে হয়, পাঠকরা সেই ধারণা এই লেখাটির মাধ্যমে পেয়েছেন। আবু হাসান শাহরিয়ারের পরেও যে বাংলাদেশের কবিতা নদীর মতোই প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে ব্যাপারে আমি যথেষ্ট অবগত আছি, শুধু এটুকু বলি, সেইসব কবিদের নিয়ে বলার সময় এখনও আসেনি।